স্যান ম্যারিনো
দেশের মধ্যে দেশ

● কাজী সাইফউদ্দীন বেনুনূর

জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরমে ব্রিটিশরাজ নিযুক্ত বর্ডার কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ সাহেব তখন মহা অতিষ্ঠ। মাত্র পাঁচ সপ্তাহে তাকে নির্ধারণ করতে হবে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তরেখা! ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ছেড়ে চলে যাবে ব্রিটিশরা। উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান। সরেজমিনে খবর না নিয়ে কেবল হাতে থাকা কাগজপত্রের ওপর ভিত্তি করে মানচিত্রে ছুরি চালিয়ে ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করে দিলেন তিনি। হেলাফেলায় ঠিক করে দিলেন কোন জেলা, থানা, গ্রাম কিংবা জনপদ কোন দেশের ভাগে পড়বে। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ছত্রখান হয়ে গেল শত সহস্র বছরের প্রাচীন ভারতবর্ষ।

র‍্যাডক্লিফের এই খামখেয়ালিতে উভয় দেশে জন্ম নেয় অসংখ্য ছিটমহল। আজ এতদিন পরেও বাংলাদেশ এবং ভারতকে নিজ নিজ সীমানার আশপাশে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে এই সমস্যাকে। ভারতের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের কয়েকশ ভূমিখণ্ড, যা চারদিকে ভারতীয় জমি দিয়ে ঘেরা। একইভাবে বাংলাদেশের মধ্যেও রয়েছে ভারতের বহু ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডগুলোই ছিটমহল নামে পরিচিত। ভৌগোলিকভাবে যত অদ্ভুতই হোক, র‍্যাডক্লিফের বদৌলতে আমরা আজ ছিটমহল শব্দটার সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। কিন্তু একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশের অভ্যন্তরে ছিটমহল হয়ে অবস্থান করছে– এমনটা বেশ কষ্ট-কল্পনাই বটে। 'স্যান ম্যারিনো' তেমনি এক দেশ।

২০০৯ সালে যখন প্রথমবার ইতালি ভ্রমণে যাই, জানতে পারি স্যান ম্যারিনো নামের দেশটা চারদিকে ইতালির ভূখণ্ডে বেষ্টিত– যাকে বলে একেবারে ইতালির পেটের মধ্যে। প্রথম থেকেই একটা অন্যরকম আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি স্যান ম্যারিনোর জন্য। ইতালির মতো একটা প্রবল প্রতাপশালী দেশের মধ্যে কী করে টিকে আছে একটা বিন্দুসদৃশ দেশ, বুঝে উঠতে পারি না। তাদের স্বকীয়তাটা কোথায় এবং কেনইবা তারা আলাদা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের আশায় মন টানতে থাকে স্যান ম্যারিনো ভ্রমণের জন্য। কিন্তু সেবার আর হয়ে ওঠে না ইচ্ছেপূরণ। ২০১৩ সালে যখন আবার ইতালি ভ্রমণের সুযোগ এলো, স্যান ম্যারিনোকে অতি-অবশ্যই রেখে দিলাম ভ্রমণ তালিকায়। রোম থেকে মিলান যাওয়ার পথে একদিনের যাত্রাবিরতি নিলাম স্যান ম্যারিনোর নিকটবর্তী শহর বোলোনিয়ায়। একরাত বোলোনিয়ায় কাটিয়ে পরদিন ভোরেই রওনা হলাম স্যান ম্যারিনোর উদ্দেশে।

ইন্টারনেট ঘেঁটে তথ্য পেলাম, এরকম 'ছিট-রাষ্ট্র' পৃথিবীতে রয়েছে মোট তিনটি। স্যান ম্যারিনো, দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে 'লেসোথো' এবং ভ্যাটিকান সিটি। ভ্যাটিকানকে অবশ্য রাষ্ট্র বলতে আমার মন সায় দেয় না। ইতালির রাজধানী রোমের মধ্যখানে খ্রিস্টধর্মের প্রধান গুরু পোপের কর্মস্থল এবং তৎসংলগ্ন পবিত্র উপাসনালয়কে ঘিরে ক্ষুদ্র একটি এলাকাকে আলাদা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। স্বয়ং পোপ এই অঞ্চলের অধিকর্তা। এখানে নেই কোনো নির্বাচন ব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র কিংবা রাজতন্ত্র। সেই হিসেবে ভ্যাটিকান একটি নিরপেক্ষ ধর্মভিত্তিক এলাকা মাত্র। একটি শহরের মধ্যে আলাদা দেশ হিসেবে দাবি করা ভ্যাটিকানকে বাদ দিলে বিশ্বে ছিট-রাষ্ট্র মাত্র দুটি। লেসোথো দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে হলেও এটি মূলত পর্বতসঙ্কুল এলাকা। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূগঠন থেকে এটি বেশ আলাদা। লেসোথোতে মূলত বাস করে একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী, যারা বাসুতো নামে পরিচিত। স্যান ম্যারিনোর ক্ষেত্রেও এমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা–এমন প্রশ্ন মাথায় নিয়েই আমরা চললাম তার অভিমুখে।

বোলোনিয়া শহর পার হয়ে আমাদের বাস অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ধরল। দুধারে অফুরন্ত সবুজ শস্যের বিস্তার। যেন

গ্রামবাংলার ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছি। তবে ক্ষেতের মাঝে ঘন ঘন আঁকাবাঁকা আইলের অস্তিত্ব নেই এখানে। মনে হয় যেন যৌথ খামার হিসেবে গড়ে উঠেছে এই শস্যক্ষেত্রগুলো। গাড়ি ধীরে ধীরে পাহাড়ি পথ ধরল। সমতল ভূমি ছেড়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। সেই সঙ্গে বদলে যেতে লাগল দুপাশের দৃশ্য। সবুজকে হটিয়ে স্থান করে নিল হলুদ বর্ণ। পাহাড়ের ধাপে ধাপে যতদূর চোখ যায় কেবল সূর্যমুখী ফুলের সমারোহ। শৌখিন বাগান হিসেবে নয়, ক্ষেতের পর ক্ষেত জুড়ে চলেছে এই ফুলের আবাদ। সূর্যমুখীর বীজ দিয়ে তৈরি হয় তেল। এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থকরী ফসল এটি। একটা নয়নসুখকর স্নিগ্ধ ফুল যে অর্থনীতির প্রভাবে এমন বিকট আয়তন নিয়ে হাজির হতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। একটু একটু করে সূর্যের তেজ বাড়তে লাগল। সূর্যমুখীর ক্ষেতে যেন জ্বলতে লাগল হলুদ আগুন। বেশিক্ষণ চোখ রাখা দায়। মনে হতে লাগল ভ্যান গগের কোনো ছবির বিশাল ক্যানভাসে ঢুকে পড়েছি। এগিয়ে চলেছি পিঁপড়ের মতো গুটি গুটি পায়ে।

সূর্যমুখীর ক্ষেত

পাহাড়ের গা ধরে খানিকটা উপরে উঠতেই আস্তে আস্তে শহরের আবহ ফুটে উঠতে লাগল। অসমান আকৃতির পাথর খণ্ড ফেলে তাকে ঘষা-মাজা করে তৈরি করা হয়েছে রাস্তা। কোথাও কোথাও পাথর খুঁড়ে বানানো হয়েছে রাস্তার পাশের রেলিং বা তোরণ। এক সময় ইতালির সীমানা অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করলাম স্যান ম্যারিনোতে। আমাদের সঙ্গে থাকা ট্যুর গাইড না বললে বুঝতেই পারতাম না এই দেশান্তর। এখানে সীমান্তের কোনো নিশানা নেই। নেই কোনো পাসপোর্ট, ভিসা কিংবা নিরাপত্তা তল্লাশি।

আমাদের বাস থামল একটা বড়সড় চাতালে। এখান থেকে ট্রামে চড়ে যেতে হবে স্যান ম্যারিনোর প্রাণকেন্দ্রে। সেটি আরো বেশ খানিকটা ওপরে, মাউন্ট টিটানো পাহাড়ের চূড়ায়। এলাকাটি পাথুরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার রাস্তাগুলো এতটাই সরু যে গাড়ি চলতে পারে না। ট্রাম থেকে নেমে হেঁটেই ঘুরে দেখে নেয়া যায় পুরো শহর। ছোট্ট শহরটার প্রান্তসীমায় তিনটি উঁচু টাওয়ারসদৃশ দুর্গ– যেন পাহারা দিচ্ছে স্যান ম্যারিনোকে।

তিনটি দুর্গ যেন পাহারা দিচ্ছে স্যান ম্যারিনোকে

আমরা হেঁটে চললাম পাথুরে রাস্তা ধরে। ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। পথ-ঘাট এবং দুপাশের বাড়িঘর– সবকিছুর আদলেই রয়েছে প্রাচীন আমলের নকশা। কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই পুরনো কিংবা জীর্ণ নয়, সবই ঝকঝক করছে। প্রাচীন আবহের কারণে হঠাৎ মনে হচ্ছে, এই যেন ভারী পাথরের আর্চ-এর নিচের লোহার গজাল মারা কাঠের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে পুরনো কেতার পোশাক-আশাক পরা কোনো পুরুষ। কোমরে ঝুলবে তরবারি। কিংবা লম্বা গাউন পরা কোনো নারী কাঁখে বেতের তৈরি ফুলের ঝুড়ি নিয়ে হেঁটে যাবে রাস্তা ধরে। কল্পনার দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে মুহূর্তেই। দরজা খুলে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বেরিয়ে আসছে জিন্স-টিশার্ট পরা কোনো যুবক কিংবা স্কার্ট-টপস পরা কোনো ললনা। ইতালিয়ান, রুশ কিংবা ইংরেজি ভাষায় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার রেস্তোরাঁ কিংবা স্যুভেনির শপে ঢোকার জন্য।

স্যান ম্যারিনোকে বলা চলে স্যুভেনির শপের স্বর্গ। ছোট্ট দেশটির রাজস্বের সিংহভাগ আসে পর্যটন খাত থেকে। পর্যটকদের আকর্ষণ করে তাদের গাঁটের পয়সা কিছুটা খসিয়ে নেয়ার জন্য মনোলোভা পণ্যের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি অগণিত দোকান। প্রাচীন যোদ্ধাদের বিশাল ভারী বর্ম কিংবা তরবারি থেকে শুরু করে চুলের ক্লিপ পর্যন্ত সবই পাওয়া যাচ্ছে এখানে। স্যান ম্যারিনোর নৈসর্গিক দৃশ্যকে ধারণ করা নানা রকম ছোট ছোট প্লেট, গ্লাস, ডেকোরেশন পিস, ফ্রিজ ম্যাগনেট রয়েছে এখানে। দেশে নিজ বাড়িতে ফ্রিজের গায়ে শোভা পাচ্ছে বহু দেশের স্মারকচিহ্নরূপী ফ্রিজ ম্যাগনেট। একটা একটা করে জমাতে জমাতে এটা এখন যেন আমার নেশায় পরিণত হয়েছে। নতুন কোথাও গেলে তাই ফ্রিজ ম্যাগনেট কেনাটা আমার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, স্যান ম্যারিনোর দৃশ্যসমৃদ্ধ এই স্যুভেনিরগুলোর প্রায় সবই চীনের তৈরি। এরই নাম বাণিজ্যিক আগ্রাসন!

সূর্যমুখী ক্ষেত

স্যান ম্যারিনোর পথ-ঘাট

স্যান ম্যারিনোর সবচেয়ে বড় দুর্গটির নাম 'রোসা গুয়াইতা'। দ্বিতীয়টির নাম 'রোসা সেস্‌তা'। এই দুটিতে পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারেন দর্শনীর বিনিময়ে। সবচেয়ে ছোট দুর্গ 'ইল মন্‌তালে' ব্যক্তিমালিকানাধীন। তাই ওটাতে প্রবেশ করা যায় না। আমরা প্রবেশ করলাম 'রোসা সেস্‌তা'তে। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তার শীর্ষদেশকে কেটে কেটে দুর্গের খাঁজকাটা প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। সরু বারান্দাসদৃশ অংশ থেকে নিচে চোখে পড়ল সবুজের গাঢ় সমারোহ। দূরে প্রায় দিগন্তরেখার কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ি-ঘরের সমাবেশ। ইতালির কোনো শহরতলি। দুর্গের অভ্যন্তরে একটি ছোট্ট কক্ষে সাজানো আছে নানা রকম প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র। রয়েছে বন্দিকে উৎপীড়নের বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি। বিমূঢ় হয়ে ভাবলাম, এই মহা-দুর্গম এলাকার ইতিহাস মানেও যুদ্ধ সরঞ্জাম, মানুষকে নির্যাতনের কলকব্জা। পৃথিবীর সর্বত্রই তো তা-ই দেখি! বোধকরি মানবসভ্যতা মানেই এই– যুদ্ধ, হত্যা আর নিপীড়ন। ধ্বংসের মধ্য দিয়েই হয়তো সৃষ্টি হয় সভ্যতার নতুন অধ্যায়।

ষাট বর্গকিলোমিটারের দেশটা আয়তনে ঢাকা শহরের প্রায় দশভাগের একভাগ। সে দেশের রাজধানী দেখতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগল না। দুপুর হতে তখন অনেক বাকি। এখানে রয়েছে দুটি মিউজিয়াম। একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর, অন্যটি 'মিউজিও দেলা কিউরিওসিটা' বা আজগুবি জিনিসের জাদুঘর। আমরা কেউই খুব একটা শিল্পবোদ্ধা নই। তাই আজগুবির দিকে ধাবিত হলাম সবাই। কিন্তু হতাশ হতে হলো যারপরনাই। 'রিপ্লিস বিলিভ ইট অর নট' জাতীয় কিছু বিদঘুটে জিনিস সাজিয়ে রাখা আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা মানুষ, সবচেয়ে লম্বা দাড়ি, সর্ববৃহৎ পাখির ডিম, সব সময় মাথা নিচের দিকে রেখে ঝুলে থাকা বানর– ইত্যাদির রেপ্লিকা। বের হয়ে মনে হতে লাগল দুর্বোধ্য হলেও চিত্রকর্ম দেখাই ভালো ছিল।

স্যান ম্যারিনোর ভিসা

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠল। শুরু হবে নির্বাচিত হচ্ছেন স্যান ম্যারিনোর শাসনকর্তারা।

প্রতিদিন দুপুর একটায় সংসদ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষীদের দায়িত্ব বদল হয়। উদ্দেশ্য সেই অনুষ্ঠান দেখা। আমাদের মতো প্রায় শ'খানেক পর্যটক জড়ো হলাম পাবলিক প্লাজায়। একপাশে চোখে পড়ল স্যান ম্যারিনোর ইমিগ্রেশন অফিস। যে দেশে কোনো সীমান্ত পাহারা নেই, নেই প্রবেশের জন্য ভিসার আবশ্যকতা, তাদের আবার ইমিগ্রেশন অফিস! অনুসন্ধিৎসু হয়ে জানতে পারলাম এখানে চাইলে পাঁচ ইউরোর বিনিময়ে পাসপোর্টে স্যান ম্যারিনোর ভিসা লাগিয়ে নেয়া যায়। যদিও এর কোনো আইনগত প্রয়োজনীয়তা নেই, তবু স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেয়ার জন্য ব্যবস্থাটা বেশ ভালো লাগল।

স্যান ম্যারিনোর পথ-ঘাট

সবশেষে আমরা এলাম 'পালাজো পাবলিকো' অর্থাৎ পাবলিক প্লাজায়। এর পাশেই রয়েছে স্যান ম্যারিনোর সংসদ ভবন। বিশ্বের প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র এই স্যান ম্যারিনো। ৩০১ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ইউরোপজুড়ে তখন চলছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। শক্তিশালী রোমান সম্রাটের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে সেন্ট ম্যারিনাস নামক এক সাধু তার শিষ্যদের নিয়ে উঠে আসেন এই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে। প্রতিষ্ঠা করেন এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের। বিশ্ব তখনও পায়নি গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা। কিন্তু তখন থেকে আজ অবধি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রক্ষীবদল। আমরা এগিয়ে গেলাম সংসদ ভবনের ফটকের কাছে। বাজনার তালে তালে হালকা সবুজ এবং লাল রঙের ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন সুসজ্জিত সেনা কুচকাওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। সারিবদ্ধভাবে তারা মুখোমুখি দাঁড়ালেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকদল রক্ষীর সামনে। দলনেতা চিৎকার করে কিছু একটা কমান্ড করলেন। প্রতীকীভাবে চাবি হস্তান্তর হলো পরবর্তী দলনেতার কাছে। তারপর নতুন দলটা কুচকাওয়াজ করে ঢুকে গেল ভেতরে। পুরনো রক্ষীরা এবার দর্শকদের দিকে ফিরে কিছুক্ষণ প্যারেড করলেন। অভিবাদন জানালেন সবাইকে। পুরো ব্যাপারটিতে কোনো আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি নেই, রক্ষীরা সব হাতের নাগালের মধ্যেই। তাদের কাছে কোনো ভারী অস্ত্রশস্ত্রও নেই। পুরোটাই যেন একটা খেলা, রূপকথার অংশ।

সংসদ ভবনের ফটকে রক্ষীবদল

রক্ষীবদল পর্ব শেষ হলে পাবলিক প্লাজার একপাশে আমরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম জোহরের নামাজ আদায় করতে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছেন আমাদের। হয়তো অনেকের কাছেই নামাজ পড়ার দৃশ্যটা নতুন। কেউ কেউ ফটোও তুললেন আমাদের। রক্ষী বদলের কুচকাওয়াজের পর আমাদের জামাতে নামাজ পড়াটা পর্যটকদের কাছে বোধহয় বোনাস হিসেবে ধরা দিল।

নামাজ শেষে মধ্যাহ্ন ভোজের উদ্দেশ্যে জড়ো হলাম পাহাড়ের ধার ঘেঁষা এক রেস্টুরেন্টে। রেস্তোরাঁর কর্মী জানালেন, স্যান ম্যারিনোর নিজস্ব বিখ্যাত খাদ্যের নাম 'পিয়াদিনা'। মাংস, পনির আর সবজির মিশ্রণকে ময়দার রুটি দিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি। বিদেশে হালাল সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আমরা কেউ মাংস খাই না। পিয়াদিনার স্বাদ তাই নেয়া হলো না। মাছ আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই চোখ গোল হয়ে উঠল তার। চারদিক জমিনে আবদ্ধ। এই পাহাড় চূড়ায় মাছের সন্ধান করাটা যে বোকামি হয়েছে বুঝতে পারলাম। অতএব ডালের স্যুপ আর বিশাল এক বাটি সালাদ নিয়ে বসলাম। শসা আর টমেটোর টুকরার সঙ্গে সেখানে রয়েছে অজস্র নাম না জানা ঘাস-পাতার সমারোহ। শাক-পাতা চিবুতে চিবুতে রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে গেলাম। পাশে বসা ফেরদৌসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগছে আজকের আহার?' গম্ভীর মুখে বলল, 'নিজেকে ছাগ-শিশু মনে হচ্ছে। যে কোনো সময় ব্যাঁ ব্যাঁ করে উঠতে পারি!'

'পিয়াদিনা'- স্যান ম্যারিনোর নিজস্ব খাবার

ইচ্ছে ছিল দুপুরের খাবার শেষ করে চেখে দেখবো স্যান ম্যারিনোর স্পেশাল ডেজার্ট 'তোর্তা ত্রে মন্‌তে' বা তিন দুর্গের কেক। জিনিসটা স্যান ম্যারিনোর দুর্গত্রয়ের আকারে প্রস্তুত চকোলেট কেক। দেখে এছাড়া ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হলো না। দুর্গের আকার না দিয়ে মিকি মাউস বানালেও বোধহয় খেতে একই রকম লাগবে। কিন্তু দাম দেখি আকাশছোঁয়া। পর্যটকদের পয়সা খসানোর বিশেষ ব্যবস্থা বলেই মনে হলো। আমরা সে ফাঁদে পা দিলাম না। ফিরে এলাম আমাদের বাসে। পরবর্তী গন্তব্য মিলান শহরের উদ্দেশে রওনা হতে হবে এখনই। ■